গৌর চন্দ্রিকা মানেই গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ কিন্তু গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ মানেই গৌরচন্দ্রিকা নয়। [illegible]

বাংলা সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য রূপ লাভ করে বৈষ্ণবযুগে। বৈষ্ণব কবিরা তিন শতাব্দী ব্যাপি এমনটি আধুনিক কালেও নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় এই পরিপুষ্টি ও পরিণতি দান করে চলেছেন। অথচ এই বিরাট সাহিত্যের মূলে রয়েছে একটি মাত্র মহাপুরুষের অলৌকিক জীবন — তিনি গৌরচন্দ্র অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য দেব, যার আচরণ মানব প্রেম তাঁকে বৈষ্ণব দের কাছে মহান করে তুলেছেন। অনেক পদকার পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছেন যে, —

"যদি গৌরাঙ্গ না হইত কী হইত কেমনে ধরিতাম দে, অতএব তাঁর নিছনি যাইয়া রাধা কৃষ্ণ যে হইলা একত্র একা স্বাভাবিক।

গৌরচন্দ্র কথার অর্থ হল, গৌরাঙ্গ রূপ চন্দ্র, আর গৌর চন্দ্রিকা কথার অর্থ হল গৌরাঙ্গ রূপ চন্দ্রের - কিরণ। গৌরচন্দ্র অর্থাৎ গৌরাঙ্গকে নিয়ে লেখা পদ মাত্র গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ, কিন্তু গৌরচন্দ্রিকার অধিকার শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যের কালীয়দমন বা রাসলীলা সীমাবদ্ধ। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম লীলাকে বৈষ্ণব কবিরা পূর্বরাগ, অনুরাগ পরিলীলন, অভিসারলীলা, মাথুর প্রভৃতি নানাভাবে বিভক্ত করে গেছেন। লীলা কীর্তনে যে বিশেষ সুরের বা কিংবা বিশেষ শ্রেণীর গান গাওয়া হয়, গায়ক অর্থাৎ কীর্তনীয়া বিভিন্ন রাগ রাগিণী সেই বিশেষ শ্রেণীর বা বিশেষ রসের পদগুলিকে ক্রমশ সাজিয়ে নিয়ে যে লীলা গান করেন তাকেই বলা হয় পালাযুক্ত কীর্তন, এই কীর্তনের আরম্ভের পূর্বে সেই সব রসের যে গৌর লীলার সাথে সাদৃশ্য হয় তাকেই বলা হয় গৌরচন্দ্রিকা যেমন —

"আজু হাম কী কহব রেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ।
ধরতলে বরহু রয়ল অবলম্ব।।"

এই গৌরচন্দ্রিকার গীতি গাওয়ার সময় বোঝা যায় পদকার পূর্বরাগে আকাঙ্ক্ষিত রাধার ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া ও ভক্তের চিত্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং কবির পূর্বরাগের স্থায়ীভাবই গৌরচন্দ্রিকার পাঠক পড়তে গিয়ে কীর্তনীয়া অভিনীত হয়ে প্রবেশ করেন বিদ্যাপতি লীলায়

Shot on realme 3i

Scanned with CamScanner

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।" — পদটিতে

অন্যত্র 'আজু রজনী হাম' পদটি লীলাচক্রিকার পদ।

আসলে বৈষ্ণব পদকর্তারা বৈদগ্ধীর যখন
অনুভূতি সুবলিত হয়ে স্বপ্ন স্মৃতি অবলম্বন করেছেন প্রধানত,
বেশীরা তাঁদের মধ্যে লীলাচক্র হলেন যারা কৃষ্ণের মিলিত
বিরহ — বাহিরে তিনি শ্রীদাম, অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ। একটি বেলা
যার লীলাচক্রিকার পদ লীলাধরকে নিয়ে হলেও পালাবদল তা
লীলাদের সঙ্গে তা সীমাবদ্ধ হয়েই রয়েছে।

এবার চলি লে লীলাধর
বিষয়ক অধিকাংশ পদই রসপ্রচুর বা মহিমা জ্ঞাপক, কিন্তু
সকল পদই লীলার লীলাদের মূল রস বা মূল পর্যায়কে
ধরতে সমর্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে এখানে লীলাধর বন্দনা করেছে —

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুর অবলম্ব।"

— ইত্যাদি পদগুলি লীলাধর
বিষয়ক পদ-ই বেশি হবে। পদটিকে কখনও লীলাচক্রিকা
বিষয়ক পদ বলা যাবে না। যার বৈষ্ণবদের ভাষায় —
বলা যায়, "লীলাচক্রিকা ব্রজলীলার পরাকাষ্ঠাংশে এক বিন্দু
বর্ষণ।"

১৫. উ

"সই কেবা শোনাইল শ্যাম নাম"
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।
আকুল করিল মোর প্রাণ।" — পদটির পদকর্তা কে? কোন পর্যায়ের পদ? 'পশিল' শব্দের অর্থ কী? 'শ্যাম' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তার মনোভাবটি স্পষ্ট কর। [৬]

উ. আলোচ্য পদের পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস।

আলোচ্য অংশটুকু বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের 'পূর্বরাগ ও অনুরাগ' পর্যায় ভুক্ত নামানুরাগ ও শ্রবণানুরাগের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আলোচ্য পদে 'পশিল' শব্দের অর্থ 'প্রবেশ করল'।

'শ্যাম' বলতে এখানে শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝানো হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তিতে নবধা ভক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে — শ্রীবিষ্ণুর নাম গুণ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য, নিবেদন এই নয় প্রকার ভক্তির শেষের অন্যতম কৃষ্ণের নাম গুণ শ্রবণে রাধার হৃদয়ে যে ভাবোদ্গম ঘটেছে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামের মাধ্যমে শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে তা তুলনারহিত। যাঁকে শ্যাম নাম শ্রবণ করেই প্রাণ-মন আকুলিত করে তুলেছেন। শ্যাম নামের মধুরতাই তার মধ্যে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে। বস্তুত আলোচ্য অংশে আকাঙ্ক্ষিতার ও অপূর্ব পরিস্ফুটে উঠেছে। ঈশ্বর নাম শ্রবণ মানুষের প্রাত্যহিক-জীবনকে দূর করে নতুন এক লোকে উত্তরিত করে তোলে। পদকর্তা রাধার মুখ দিয়ে যেন তাই বলতে চেয়েছেন যে, শ্যাম নাম শ্রবণে আকুল করিল মোর প্রাণ —

সই কেবা শোনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

Shot on realme 3i

Scanned with CamScanner

৪.খ.

দীর্ঘউত্তর কারণসহ ভেবেচিন্তে বলতে কী বোঝায়? এই ভাবনাকে পরিবর্তনের কারণ কী? বৈদিক সংস্কৃতি আলোচনায় রাখ। [১০]

ভেবেচিন্তে বলা বলতে বোঝায় যে কোনো কাজ করার আগে তার ভালো-মন্দ বিচার করা। এই ভাবনাকে পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বলা যায় যে, বৈদিক সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছিল। বৈদিক সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কারণগুলি হল —

১. সামাজিক পরিবর্তন :

আর্যরা যখন ভারতে আসে তখন তারা যাযাবর জীবন ত্যাগ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। এর ফলে তাদের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। আর্যরা প্রথমে পশুপালন করত। পরে কৃষিকাজ শুরু করে। কৃষিকাজ করার জন্য তারা জমি চাষ করত। এর ফলে তাদের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। আর্যরা প্রথমে গোষ্ঠী ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছিল। পরে তারা বর্ণভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছিল। বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে জাতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ক) সম্মুখ সম্ভোগ
এবং খ) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ

সৌন সম্ভোগের অর্থ হল স্বপ্নসম্ভোগ অর্থাৎ স্বপ্ন বিষয়ে কৃষ্ণের হরিপ্রাপ্তি। সৌন সম্ভোগেরও আবার —

ক) সাধারণ।
ও খ) বিশেষ। — এই রূপ দুটি শ্রেণী করা যায়।

এক সুখ্য সম্ভোগের মত এখানেও পরিকল্পিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে আকাঙ্খিলন পর্যায়ের পদ গুলি এই স্বপ্নসম্ভোগ বা সৌন সম্ভোগেরই অন্তর্গত। কেননা আকাঙ্খিলন পর্যায়ে রাধাকৃষ্ণের যে মিলন তা বাস্তব সত্য নয়, কল্পিত মিলন। এখানে কেবল মাত্র মনে মনে মিলনের কথা চিন্তা করেছেন

ব্রজগুলী দূতীসখি শ্রীকৃষ্ণ অন্যায় ভাবের মূর্ত প্রতীক কংসকে ধ্বংসের জন্য মথুরার কর্তব্যের আহ্বানে বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা গমন করেছিলেন। বৃন্দাবনই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যলীলা, আর মথুরায় সংঘটিত হয়েছে তার ঐশ্বর্য লীলা। বৃন্দাবন ত্যাগের ঠিক অব্যবহিত পরবর্তী কালে কৃষ্ণ প্রতপ্রাণা শ্রীরাধা অপার কৃষ্ণ বিরহে পতিত হয়েছেন। শুধু তাই নয় এক অপার শূন্যতায় শ্রীরাধা তখন সংসার উদাসীন নারী, হাহাকার তখন তার জীবনের একমাত্র সম্বল। অথচ বাস্তব ও তথ্যগত উভয় দিক থেকেই শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন সম্ভব নয়। কিন্তু সংবেদনশীল এবং পরম কাতর বৈষ্ণব কবিগণ এই নির্মম নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাকাতর জীবন অভিব্যক্তির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর সমাপ্তি রেখাটি টানতে চান নি। এবং সে কারণেই তারা আকাঙ্খিলন ও ভাবোল্লাস নামে এক অভিনব নাটকীয় পর্যায় কল্পনা করেছেন, যে কল্পনায় শ্রীরাধা যেন বিরহকাতরের আতিশয্যে ভাবছেন — শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে এসেছেন, এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ অবসানে সম্পাদিত হচ্ছে পুনঃ মিলন। অথচ কৃষ্ণ যখন তখন শ্রীরাধার এহল এক প্রকারের চিত্ত বিভ্রান্তি। কেননা বৈষ্ণব রসশাস্ত্র 'উজ্জ্বল নীল মণি' গ্রন্থে ভাবোল্লাস পর্যায়ের কোন পদ নেই। অন্যদিকে 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বল নীল মণি' গ্রন্থে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার প্রতি সখি গণের স্নেহাতি শয্যা কে ভাবোল্লাস বলা হয়েছে। ক্ষেত্র দাসের 'পদ কল্পতরু' গ্রন্থের দ্বাদশ পল্লবে

যে পদ সমূহ সংকলিত হয়েছে
অভিহিত করা হয়েছে।

বৈষ্ণব
পর্যায়ে রাধা কৃষ্ণের যে
সংস্কৃত কাব্য রীতির প্রভাব
পর্যায়ের পরিকল্পনার মূলে
অনুমান করা হয়। বৈষ্ণব
কিত হয়ে থাকে কিন্তু
তিনি মনে এ যুগল রূপের
কারণেই সম্ভবত বৈষ্ণব
মিলন সাধন করেছেন। এবং
রাধাকৃষ্ণের এই রাজ্যের
বাস্তব মিলনের মত
এখানে মানুষের বিরহ প্রবা
পর হয়ে উঠেছেন, তার
স্থিরতা নেই কিংবা নেই

প্রসঙ্গত
অভিহিত হলেও ভাবোল্লা
বিষয় নয়। বৈষ্ণব প
উপেক্ষা করে এক স্বতন্ত্র
ভাবে আমরা মাত্র সম্ভোগ
দেখতে পারি কিন্তু
বৈষ্ণব পদাবলীতে
না হয়েছে তারা
কৃষ্ণ আর কখনও বৃন্দাব
বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা
সেখানে সম্ভোগের প্রদর্শ

যে বা সমূহ সংকলিত হয়েছে তাদেরকে ভাবোল্লাসের পদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে ভাবসম্মিলন পর্যায়ে রাধা কৃষ্ণের যে রূপ মিলন দেখানো হয়েছে সম্ভবত সংস্কৃত কাব্য রীতির প্রভাব জাত বলেই মনে হয়। তবে এই পর্যায়ের পরিকল্পনার মূলে ভিন্ন একটি কারণের উপস্থিতিও অনুমান করা হয়। বৈষ্ণব সাধনায় রাধা কৃষ্ণের যুগল রূপই কল্পিত হয়ে থাকে কিন্তু কৃষ্ণ বিচ্ছিন্ন শ্রীরাধার চিত্র বৈষ্ণব ভক্ত মনে এ যুগল রূপের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি করে। এ কারণেই সম্ভবত বৈষ্ণব কবি গণ কল্পলোকে রাধা কৃষ্ণের মিলন সাধন করেছেন। এও লক্ষণীয় এ পর্যায়ে বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের ভাব রাজ্যের যে মিলন বর্ণনা করেছেন তা বাস্তব মিলনের মত প্রাণময় ও আন্তরিক। বস্তুত বৈষ্ণব কবিগণ এখানে মানুষের বিরহ প্রবাস প্রাবল্য যেভাবে অনুভব করে সেই যন্ত্রণার নিরাসনেই যেন তৎপর হয়ে উঠেছেন যার মধ্যে দেব জগতের কোন কৃত্রিমতা নেই কিংবা নেই আরোপিত কোন ব্যাপার।

প্রসঙ্গত এও উল্লেখ যোগ্য যে পৃথক নামে অভিহিত হলেও ভাবোল্লাস কিংবা ভাবসম্মিলন পৃথক কোন বিষয় নয়। বৈষ্ণব পদকর্তা গণ বিরহ বা প্রবাসের নিরয় উপেক্ষা করে এক স্বতন্ত্র পর্যায় উদ্ভাবন করেছেন। আপাত ভাবে আমরা রাস সম্ভোগের সঙ্গেও ভাবসম্মিলন কে যুক্ত ভাবে দেখতে পারি কিন্তু মনে রাখতে পারি হবে প্রবাসের পরে বৈষ্ণব পদাবলীতে যে সমৃদ্ধি মান সম্ভোগের কথা বলা হয়েছে তা বাস্তবে কখনও সম্ভব নয় কারণ প্রবাসের পর কৃষ্ণ আর কখনও বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেন নি। তাহারা বৈষ্ণব পদাবলীতে সুধা পরকিয়া বলে যেখানে সমৃদ্ধি মান সম্ভোগের